**ATMADEEP**
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 905-911
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.305**

# আধুনিক ভারত গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি: একটি পর্যালোচনা

**আব্দুল আলিম শেখ,** *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, ডোমকল কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

Swami Vivekananda was not merely a spiritual leader; he was one of the foremost social revolutionaries of modern India. His life philosophy reflects a successful synthesis of the rationalism of the Brahmo Samaj, the syncretism of Sri Ramakrishna, and the liberal humanism of Buddhism. Transcending the boundaries of traditional spirituality, he established himself as a modern and scientifically-minded social reformer. Vivekananda's ideal of 'Man-making education' prioritized character building over the colonial system's clerk-producing education, and his perspectives on women's empowerment and the abolition of the caste system were remarkably revolutionary. Furthermore, his active inspiration behind industrialization and the expansion of advanced scientific research—most notably his influence on Jamsetji Tata's research projects and the promotion of indigenous technical industries—added a new dimension to India's progressive journey. By introducing the concept of 'serving living beings as Shiva' (*Shib-gyane Jiv-seba*), he integrated spirituality with *Karma Yoga*, regarding the service of the distressed as the ultimate religion. In today's individualistic and fragmented society, his eternal philosophy serves as an indispensable guide for fostering human unity and solidarity. This discourse provides a profound analysis of Vivekananda's multifaceted progressive thoughts and their practical applications in the context of the contemporary world, highlighting his call for women's self-reliance and his stinging critique of untouchability as a 'demonic trait.'

**Keywords:** Patriotism, Progressiveness, Caste system, Industrialization, Scientific temper, Education

বর্তমান বিশ্বের ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতা ও স্বার্থপরতার আবহে স্বামী বিবেকানন্দের শাশ্বত জীবনদর্শন এক অপরিহার্য দিকদর্শন হিসেবে প্রতিভাত হয়। ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিমনস্কতা, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য এবং বৌদ্ধধর্মের উদার মানবিকতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাঁর এই কালজয়ী ব্যক্তিত্ব ১৮৯৩ সালের শিকাগো বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় ঐতিহ্যের এক অনন্য গৌরবময় অধ্যায় সূচনা করেছিল। মূলত, স্থবিরতায় আচ্ছন্ন এক জাতিকে প্রাচীনত্বের জড়তা থেকে মুক্ত করে আধুনিক প্রগতির পথে চালিত করার যে গুরুদায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তা-ই তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা ও বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার মূল ভিত্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বহুত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের মূল সুর। তাঁর এই দর্শনের মূলে সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কালজয়ী বাণী— 'যত মত তত পথ' চিরকাল এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। উপনিষদ তাঁর সামনে সমন্বয় ও ঐক্যের যে সুগভীর জগত উন্মোচিত করেছিল, তা স্বামীজীর মানসপটে স্থায়ী রেখাপাত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় সমসাময়িক বিবেকানন্দও মানবিক ঐক্যের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কবির ভাষায় যা প্রতিফলিত হয়েছে— 'একের অনলে বহুর আহুতি দিয়া বিভেদ ভুলিয়া জাগিয়া উঠিল একই বিরাট হিয়া।'[i] তিনি উপনিষদের 'চরৈবেতি' (এগিয়ে চলো) মন্ত্রে পরম আস্থা জ্ঞাপন করতেন। স্বামীজীর মতে, সচল থাকাই জীবনের ধর্ম, আর স্থবিরতা বা নিশ্চলতা হলো মৃত্যুরই নামান্তর। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবল বাগাড়ম্বর নয়, বরং নিরন্তর কর্মতৎপরতার মাধ্যমেই একজন প্রকৃত মানুষকে চেনা সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে কেবল একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড নয়, বরং জীবন্ত মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেন। এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করে তিনি অকৃত্রিম গর্ব অনুভব করতেন। তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষের লাঞ্ছনা ও চরম দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে তাঁর সংবেদনশীল হৃদয় গভীরভাবে ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। দেশের এই অবক্ষয়ের মূলে তিনি মূলত জনসাধারণের অশিক্ষা এবং জীবনবিমুখ কুশিক্ষাকেই প্রধানত দায়ী করেছিলেন। বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল একটি অখণ্ড ভারত গঠন করা, যা গড়ে উঠবে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ বিভেদহীন এক উদার ভাবনার আলোকে। তাঁর কাছে জাতীয়তাবোধ ছিল অত্যন্ত পবিত্র এক চেতনা; যেখানে ব্যষ্টির 'আমিত্ববোধ' যখন সমষ্টির 'আমরাবোধ'-এ উত্তীর্ণ হয়, তখনই প্রকৃত জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। জাতিগঠনের পথে তিনি জাতিভেদ প্রথাকে একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায় বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং ধর্মীয় মেরুকরণের সংকীর্ণতাকে তীব্রভাবে নিন্দা জানাতেন। যদিও তিনি ভারতকে সনাতন ধর্মের চারণভূমি বলে মনে করতেন, তবে তিনি সর্বদাই সেই ধর্মের উদার ও সর্বজনীন রূপটিকেই দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। সামাজিক জাগরণ ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের প্রধান সোপান হিসেবে স্বামীজী শিক্ষাকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তাঁর দর্শনে শিক্ষা কেবল বাহ্যিক কোনো তথ্য আহরণ নয়, বরং মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার জাগরণ। শিক্ষার কালজয়ী সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "Education is the manifestation of the perfection already in man."[ii] তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত শিক্ষাই পারে একজন মানুষকে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং পরিশেষে দেবত্বে উন্নীত করতে। স্বামীজীর এই শিক্ষাভাবনা ছিল তদানীন্তন কেরানি তৈরির ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি কেবল ডিগ্রি অর্জন কিংবা পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের নির্বাচিত অংশ মুখস্থ করাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে মানতেন না। বাল্যকাল থেকেই কেবল নম্বর অর্জনের এই যান্ত্রিক প্রতিযোগিতাকে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা করতেন। তাঁর ভাষায়, "মাথার মধ্যে একগাদা আজে-বাজে জিনিস ঠেসে রেখে কি ফল? আমি শুধু পাস করবার জন্য কলেজের পড়া পড়ি। ডিগ্রি দরকার, অন্ন জুটবে না।"[iii] বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল এমন এক 'মানুষ গড়ার শিক্ষা' (Man-making education), যা ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে। এই ক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তিনিও চেয়েছিলেন প্রাচ্যের মহান আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতার এক সার্থক মেলবন্ধন ঘটাতে। স্বামীজী মনে করতেন, জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা থাকা একান্ত আবশ্যক। তাই কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় মগ্ন না থেকে বলিষ্ঠ চারিত্রিক গঠন ও শারীরিক সক্ষমতার ওপর জোর দিয়ে তিনি তরুণ সমাজকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা শ্রেয়'। তাঁর এই প্রগতিশীল শিক্ষাভাবনা ছিল অত্যন্ত গণতান্ত্রিক ও জনমুখী। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার আলো সমাজের প্রতিটি স্তরে, বিশেষ করে দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের

দোরগোড়ায় পৌঁছানো উচিত। এ প্রসঙ্গে তাঁর সেই বিশ্ববিখ্যাত উক্তিটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক: "... পর্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্বতের নিকট গিয়েছিলেন। সেইরূপ দরিদ্র সকল যদি শিক্ষালয়ে আসিতে না পারে, তবে তাহাদের নিকট শিক্ষক পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।"[iv] মূলত, আপামর জনসাধারণের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও স্বনির্ভরতার বোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর বৈপ্লবিক শিক্ষা দর্শনের মূল ভিত্তি। শিক্ষার এই উদার ও সর্বজনীন প্রসারের সমান্তরালে স্বামীজী সমকালীন সমাজে নারীর শোচনীয় অবস্থা পরিবর্তনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীসমাজের অবস্থান ছিল অত্যন্ত করুণ, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের মানুষের তুলনায় অধিক লাঞ্ছিত। সে যুগে নারীরা শিক্ষার অধিকার থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার ভাষ্য অনুযায়ী, বিবেকানন্দ মনে করতেন তাঁর আদর্শ ও সঙ্ঘের অন্যতম প্রধান ব্রত হলো নারীজাতি ও অবহেলিত জনসাধারণের উন্নতি সাধন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নারীকে শিক্ষার সুযোগ দিলে তারা নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যতের সমস্যাবলি মীমাংসা করতে সমর্থ হবে। বিবেকানন্দ নারীর মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ ঘটাতে চাইতেন; তবে এর পাশাপাশি তিনি স্বামী ও শ্বশুরগৃহের প্রতি নিষ্ঠা এবং ঐতিহ্যানুসারী গুণাবলিকেও আদর্শ পত্নীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে মূল্যায়ন করতেন। তিনি বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনই পরিণত বয়সে বিবাহ এবং জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতার বিষয়টিও তাঁর লেখনীতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। বিবেকানন্দের এই সংস্কারধর্মী ভাবনা কেবল নারী শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি হিন্দুধর্মকে এক সংকীর্ণতামুক্ত বিশ্বজনীন রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তথাকথিত 'ছুৎমার্গ' ও আচারসর্বস্ব হিন্দুয়ানি পরিহার করে ধর্মের এক উদার ও মানবিক রূপের জয়গান গেয়েছেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি পত্রে তাঁর এই আপসহীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে তথাকথিত অস্পৃশ্য বা বারবনিতাদের অংশগ্রহণে সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষেরা আপত্তি তুললে তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, "বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।"[v] তিনি তীর্থস্থান ও উপাসনা ক্ষেত্রকে জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ ও ধনভেদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ধর্মপ্রাণতার নামে যারা সাধারণ মানুষ বা দরিদ্রদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে, তাদের মানসিকতাকে তিনি 'রাক্ষসীভাব' বলে অভিহিত করেছেন এবং প্রগতিবাদী কণ্ঠে জানিয়েছেন যে, সমাজের এই ছদ্মবেশী 'ভদ্রলোক'দের সংখ্যা হ্রাস পাওয়াই মঙ্গলকর। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ছিলেন এক মহান মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব, যাঁর কাছে ধর্মের চেয়ে মানুষের মর্যাদাই ছিল মুখ্য।

ব্যক্তির মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য স্বামীজী শারীরিক সক্ষমতাকে অপরিহার্য মনে করতেন, আর এখানেই উঠে আসে তাঁর খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মের সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসের যে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে, তা তিনি অস্বীকার করেননি; তবে ধর্মের কঠোর অনুশাসনের পরিবর্তে তিনি শরীর ও মনের প্রয়োজনকে অধিক অগ্রাধিকার দিয়েছেন। জাতির দুর্বলতা দূর করতে তিনি আমিষ খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাঁর শিষ্যকে দেওয়া নির্দেশে পাওয়া যায়, "(মাছমাংস) খুব খাবি বাবা। তাতে যা পাপ হবে তা আমার।"[vi] বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন যে, আমিষভোজী অন্যান্য জাতিসমূহ স্বাস্থ্যের দিক থেকে অনেক বেশি বলিষ্ঠ, যা তাদের জীবনসংগ্রামে সফল হতে সাহায্য করে; বিপরীতে দুর্বল শরীর নিয়ে কোনো বড় কাজ সম্পাদন করা অসম্ভব। বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব ধর্মের 'অহিংসা' তত্ত্বে তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু এই নীতিকে কারোর ওপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি শ্রুতি ও মনুস্মৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, বৈদিক যুগেও আমিষ আহারের প্রচলন ছিল। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন, মাছ-মাংস ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গের মানুষ অধিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

এইভাবে তিনি ধর্ম ও সমাজসংস্কারের প্রতিটি স্তরেই এক বিজ্ঞাননিষ্ঠ ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন।

শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তার এই আবশ্যিকতাকে স্বামীজী আরও বৃহৎ পরিসরে প্রসারিত করেছিলেন জাতির বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ভাবনায়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, কোনো জাতির প্রাণশক্তির বিকাশ মূলত নির্ভর করে সেই জাতির বিজ্ঞানমনস্কতার ওপর। তিনি বাঙালি জাতিকে একটি আধুনিক ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ জাতি হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। সমকালীন বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় ভারতের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অন্যান্য জাতিসমূহ কীভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে ভারতীয় বাজার দখল করে নিয়েছে, যার ফলে দেশীয় শিল্প ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল। এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ নির্দেশ করে তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন— "প্রতিযোগিতা-রূপ ভয়ঙ্কর মন্ত্রই সবকিছু করিয়া ফেলিবে। যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও তো নিজেকে যুগোপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা কর। আমরা যদি আদৌ বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে হইবে।"[vii] বিজ্ঞানের এই প্রায়োগিক প্রসারে স্বামীজীর দূরদর্শী ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ১৮৯৮ সালে জামসেদজী টাটা যখন উচ্চমানের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার সপক্ষে ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন, তার নেপথ্যে বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা ও সক্রিয় অবদান ছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় স্বয়ং টাটার লেখা পত্রে। স্বামীজী এই মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে একে 'সময়োচিত ও সুদূরপ্রসারী' বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং সমগ্র জাতিকে ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এই পরিকল্পনা সফল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের এই আধুনিক ভাবনার সঙ্গেই যুক্ত ছিল তাঁর শিল্পায়নের স্বপ্ন। তিনি ভারতে এক মহান শিল্পবিপ্লব চেয়েছিলেন এবং শিল্প যে আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি, সে বিষয়ে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। তিনি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে তৎকালীন ভারতে শিল্পের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়; তাঁর ভাষায়— "ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায়নি। বিশেষ দুর্দশা হয়েছে শিল্পের।"[viii] তবে এই শিল্পায়ন তিনি চেয়েছিলেন দেশীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে। কারিগরি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের শিক্ষা বিদেশ থেকে গ্রহণ করলেও নিজের শাশ্বত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাই তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন— "...নূতন শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরানোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাকি?"[ix]

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানই হবে ভারতের সার্বিক কল্যাণের চাবিকাঠি। তিনি জাপান ও আমেরিকার শিল্পোন্নয়ন থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য দেশবাসীকে বারবার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি শিল্পপতিদের দেশীয় শিল্পস্থাপনে উৎসাহ দিতেন এবং জামসেদজী টাটাকে বিদেশী পণ্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে স্বদেশে দেশলাই কারখানা স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারিগরি শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের পাশাপাশি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা তাঁর চেতনায় সদা জাগ্রত ছিল। তিনি জানতেন যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও জনশক্তি এদেশেই বিদ্যমান, যা বাণিজ্যিকভাবে দেশটিকে বিশ্বদরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে পারে, যেমনটি জাপান করে দেখিয়েছিল। ভারতের উজ্জ্বল বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি গর্বভরে বলেছিলেন— "মানবজাতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীনকাল থেকে কাজ করেছে, তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদিকাল হতে, উর্বরতায় আর বাণিজ্য শিল্পে ভারতের মতো দেশ কি আর আছে?"[x]

বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যকে সফল করতে স্বামীজী ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে এক অভিনব 'সেবাধর্মের' প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি জীবের প্রতি সাধারণ দয়া বা করুণা প্রদর্শনের পরিবর্তে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করার আদর্শকে প্রাধান্য দিতেন, যা তাঁর এই দর্শনকে অন্যান্য প্রথাগত ধর্মমতের চেয়ে পৃথক এক অনন্য

উচ্চতায় আসীন করেছে। এই সেবার অভিনব দার্শনিক ভিত্তিটি নিহিত ছিল পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অমোঘ উপলব্ধির মধ্যে; যেখানে তিনি সাধারণ 'জীবে দয়া'র ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করে আর্তের মধ্যে শিবের অস্তিত্ব অনুভব করতে এবং তাঁদের সেবা করতে বলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ব্যাখ্যা বিবেকানন্দের মনে এক 'অদ্ভুত আলোক' সঞ্চার করেছিল, যা তাঁর সমগ্র জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থাকে আমূল পরিবর্তিত করে দেয়। সেবাধর্মের এই মহান ধারণাকে বাস্তবে রূপদান করতে বিবেকানন্দ 'কর্মযোগ' বা সক্রিয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। জগতের যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় মানুষের নিষ্ক্রিয়তাকে তিনি ধিক্কার জানাতেন। তাই তাঁর উদাত্ত আহ্বান ছিল— "হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো, জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?... কাজ শুরু করিলে কার্যপ্রণালী আপনি গড়িয়া ওঠে। আমি শুধু বলি জাগো জাগো।"[xi] বিবেকানন্দের কাছে কর্মবিমুখতা ছিল মৃত্যুরই নামান্তর; তাই তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তিকে জাগ্রত করে বিশ্বমানবের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার কথা বলতেন। আচার্য শঙ্করাচার্যের মায়া-দর্শনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি এই জগতকে একতরফাভাবে 'মিথ্যা' বলে এড়িয়ে যাননি, বরং জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করে এর প্রায়োগিক দিকের ওপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মতো তুচ্ছ জীবন অতিবাহিত করার চেয়ে সত্য প্রচারের কর্মক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া অনেক বেশি সার্থক ও গৌরবের।

যদিও স্বামীজী ছিলেন মূলত আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ, তবুও জাগতিক ও বৈষয়িক বিষয়ে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা আজও আমাদের বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত করে। তিনি সমাজে সর্বদা 'রজঃ গুণের' অধিকারী তেজস্বী মানুষের সন্ধান করতেন, যাঁদের সক্রিয়তা ও সুশৃঙ্খল কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বিশ্বের চেহারাই বদলে দেওয়া সম্ভব। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সত্য, ধর্ম ও পবিত্রতা অবিনশ্বর; তাই শত প্রতিকূলতা বা দীর্ঘ সময় আবর্জনার স্তূপে ঢাকা থাকলেও সত্যের জয় অনিবার্য। আদর্শ জাতি ও চরিত্র গঠনের জন্য তিনি 'রাশি রাশি বাজে চেলার' পরিবর্তে মুষ্টিমেয় কিছু 'খাঁটি মানুষের' ওপর আস্থা রাখতেন, যাঁরা ত্যাগের মহিমায় দেশ ও দশের সেবা করতে সক্ষম হবেন। স্বামীজীর অকুতোভয় প্রগতিশীল মানসিকতা কেবল আধ্যাত্মিক বা সামাজিক সংস্কারেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তৎকালীন জটিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় টানাপোড়েনের আবহে ধর্মের নামে প্রচলিত বিভিন্ন সংকীর্ণ অনাচারের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন বজ্রকঠিন। তিনি সম্যক অবগত ছিলেন যে, যুগসঞ্চিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তবুও তিনি সত্য প্রকাশে ছিলেন আপসহীন। গোরক্ষিণী সভার প্রতিনিধিদের সাথে তাঁর সংলাপটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন যে, যে সংগঠন মানুষের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি প্রদর্শন করে না এবং যেখানে নিজের ভাই অনশনে মৃত্যুবরণ করলেও তাকে একমুষ্টি অন্ন না দিয়ে পশুপক্ষী রক্ষার নামে রাশি রাশি সম্পদ ব্যয় করা হয়, সেই সভার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। ধর্মের দোহাই দিয়ে বা কর্মফলের অজুহাতে মানুষের দুর্দশাকে অবজ্ঞা করার যে মানসিকতা তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান ছিল, স্বামীজী তাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, কর্মফলের দোহাই দিয়ে যদি মানুষের সেবা থেকে বিরত থাকতে হয়, তবে জগতে কোনো শুভ প্রচেষ্টাই সার্থক হবে না। এমনকি গোরক্ষক বাহিনীর গোঁড়ামিকে বিদ্ধ করতে তিনি যে তির্যক রসিকতা করেছিলেন, তা তাঁর অসীম সাহসিকতারই পরিচয় দেয়; যখন তিনি সহাস্যে বলেছিলেন যে, গরু সত্যিই 'মা' বলেই হয়তো এমন সব অদ্ভুত 'কৃতী সন্তান' প্রসব করেছেন। এই নির্ভীক সত্যভাষণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়ার পথে তিনি কোনো প্রকার ধর্মীয় মেরুকরণ বা ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিলেন না।

সমাজ ও রাজনীতির বৈপ্লবিক রূপান্তরের পাশাপাশি সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ভাষার গুরুত্বকেও স্বামীজী অত্যন্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছিলেন। সাহিত্য ও দর্শনের অঙ্গনে তিনি ছিলেন

এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যাঁর চিন্তা সমকালীন মননশীলতাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। সেই সময় বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে একটি তাত্ত্বিক বিতর্ক অত্যন্ত প্রবল ছিল—ভবিষ্যতে বাংলা ভাষা তার গাম্ভীর্যপূর্ণ 'সাধু' রূপেই সচল থাকবে, নাকি 'চলিত' রীতির লোকমুখী রূপটিকে গ্রহণ করবে। এই বিতর্কেও বিবেকানন্দ তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও যুক্তিগ্রাহ্য অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে চলিত রীতির পক্ষাবলম্বন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অন্যতম প্রধান মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এর ভাষা হিসেবে তিনি সচেতনভাবেই চলিত বাংলাকে বেছে নিয়েছিলেন। পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় প্রগতিশীল চিন্তা প্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বামীজী অনেক আগেই অনুধাবন করেছিলেন যে, সাধারণ মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হলে এবং সাহিত্যকে প্রাণবন্ত রাখতে হলে চলিত ভাষাই হবে অনাগত ভবিষ্যতের একমাত্র কার্যকর পথ। ভাষার এই আধুনীকরণ তাঁর সামগ্রিক প্রগতিশীল ভাবনারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, যা উচ্চবিত্তের ড্রয়িংরুম থেকে জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের আঙিনায় পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

স্বামীজীর প্রগতিশীল দর্শনের এই ধারায় আধ্যাত্মিকতা কেবল ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের পথ নয়, বরং ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার এক মহান সোপান। তিনি মনে করতেন, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে সমষ্টির হিতে কাজ করাই হলো সকল ধর্মের সারশিক্ষা। তাঁর দর্শনে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—এই তিনটি পথই ছিল আত্মজ্ঞান লাভের অমোঘ উপায়, যা সমকালীন বাঙালি জাতির চারিত্রিক পরিচিতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা ছিল আক্ষরিক অর্থেই উদার ও সর্বজনীন। তিনি প্রায়শই একটি প্রবাদ উদ্ধৃত করে সতর্ক করতেন যে, "কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মানো ভালো, কিন্তু উহার গণ্ডির মধ্যে মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর।"[xii] অর্থাৎ, তিনি চেয়েছিলেন মানুষের হৃদয় হবে প্রশস্ত এবং মস্তিষ্ক হবে যুক্তিনির্ভর ও উদারনীতিতে পূর্ণ। যে কোনো ধর্মের ইতিবাচক দিককে গ্রহণ করার সামর্থ্য অর্জন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গোঁড়ামির শিকলে আবদ্ধ রাখা ছিল তাঁর কাছে তীব্র নিন্দনীয় এক দাসত্ব। এই সুগভীর আধ্যাত্মিক চেতনার সমান্তরালে বিবেকানন্দের মননে এক আধুনিক পরিবেশ সচেতনতাও প্রবহমান ছিল। আপাদমস্তক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করতেন যে, রোগব্যাধির মূল উৎস হলো জীবাণু, যা মূলত নোংরা, পচা ও অপরিষ্কার স্থান থেকে জন্ম নেয়। পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বোঝাতে তিনি তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে প্রায়োগিক কাজে অধিক বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই কারণে কখনো কখনো নিজেই ঝাঁটা নিয়ে মঠ পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়তেন। তাঁর এই কাজে কেউ বিস্ময় বা আপত্তি প্রকাশ করলে তিনি অত্যন্ত সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে, পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন থাকলে মঠের সকলকেই অসুখ ও শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে হবে। আধ্যাত্মিক শুদ্ধির সঙ্গে পরিবেশগত এই বৈজ্ঞানিক সচেতনতার সমন্বয় স্বামীজীর প্রগতিশীল আধুনিক মননকেই অনন্য করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের প্রগতিশীল চিন্তাধারা কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের এক উজ্জ্বল ফসল ছিল না, বরং তা ছিল অনাগত আধুনিক ভারতবর্ষের এক অমোঘ দিকদর্শন। তিনি ধর্মকে মঠ ও মন্দিরের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য এবং সামাজিক সমতায় প্রয়োগ করেছিলেন। প্রাচ্যের সুগভীর আধ্যাত্মিকতা এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞাননিষ্ঠার যে সার্থক সংশ্লেষ তিনি ঘটিয়েছিলেন, তা আজও বিশ্বমানবের মুক্তি ও অগ্রগতির প্রধান চাবিকাঠি। বিবেকানন্দের 'ব্যবহারিক বেদান্ত' আমাদের শিখিয়েছে যে, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা এবং মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের সন্ধান করা। তাঁর 'মানুষ গড়ার শিক্ষা' এবং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কেবল দার্শনিক তত্ত্ব নয়, বরং একবিংশ শতাব্দীর নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে এক শক্তিশালী রক্ষাকবচ। বর্তমান বিশ্বায়িত পৃথিবীতে যখন জাতিগত

বিদ্বেষ এবং ধর্মীয় মেরুকরণ চরম আকার ধারণ করেছে, তখন বিবেকানন্দের সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ এবং অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি শান্তি ও সহাবস্থানের একমাত্র পথ। উপসংহারে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, বিবেকানন্দ ধর্মকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে যে প্রগতিশীল সমাজ কাঠামোর স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়িত করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভরশীল ও মানবিক ভারতের প্রকৃত ভবিষ্যৎ। তাঁর জীবনদর্শন ও কর্মপন্থা আজও সমকালীন ভারতবর্ষের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ধ্রুবতারার ন্যায় প্রাসঙ্গিক এবং অবিনশ্বর।

---

## তথ্যসূত্র:

[i] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩১৭)। গীতাঞ্জলি (কবিতা: 'ভারত-তীর্থ')। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

[ii] চক্রবর্তী, বরুণকুমার (২০১৫)। বিচিত্র ভাবনার গদ্য (বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনা)। দে বুক স্টোর। (পৃ. ৬১)

[iii] বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (২০১৪)। স্বামী বিবেকানন্দ নতুন তথ্য নতুন আলো। আনন্দ প্রকাশনী। (পৃ. ২)

[iv] চক্রবর্তী, বরুণকুমার (২০১৫)। বিচিত্র ভাবনার গদ্য (বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনা)। দে বুক স্টোর। (পৃ. ৬৩)

[v] বসু, কাঞ্চন (সম্পা.)। বিবেকানন্দ সমগ্র (২য় খণ্ড)। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন। (পৃ. ২৭৪)

[vi] চক্রবর্তী, শ্রীশরচ্চন্দ্র (১৯৬০)। স্বামি-শিস্য-সংবাদ। উদ্বোধন কার্যালয়। (পৃ. ১৬১)

[vii] স্বামী বিবেকানন্দ (২০০১)। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়। (পৃ. ১৩৮)

[viii] বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (২০১৩)। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৫ম খণ্ড)। মণ্ডল বুক হাউস। (পৃ. ২৪০-২৪১)

[ix] বার্ক, মেরী লুইজ (২০০০)। পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ (১ম ও ২য় খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়। (পৃ. ২১০)

[x] স্বামী বিবেকানন্দ (২০১২)। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়। (পৃ. ৮২)

[xi] বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (২০১৪)। স্বামী বিবেকানন্দ নতুন তথ্য নতুন আলো। আনন্দ প্রকাশনী। (পৃ. ৩২৪)

[xii] চক্রবর্তী, শ্রীশরচ্চন্দ্র (১৯৬০)। স্বামি-শিস্য-সংবাদ। উদ্বোধন কার্যালয়। (পৃ. ২৩৬)

## গ্রন্থপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী, শ্রীশরচ্চন্দ্র। (১৯৬০)। স্বামি-শিস্য-সংবাদ। উদ্বোধন কার্যালয়।

২. নিবেদিতা, ভগিনী। (১৯৭৫)। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি (স্বা. মাধবানন্দ, অনু.)। উদ্বোধন কার্যালয়।

৩. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (২০১৩)। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ। মণ্ডল বুক হাউস।

৪. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (২০১৪)। স্বামী বিবেকানন্দ নতুন তথ্য নতুন আলো। আনন্দ প্রকাশনী।

৫. বার্ক, এম. এল। (১৯৯২)। পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়।

৬. স্বামী, বিবেকানন্দ। (১৩৬৯)। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। উদ্বোধন কার্যালয়।

৭. স্বামী, বিবেকানন্দ। (১৩৯৬)। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সঞ্চয়ন। উদ্বোধন কার্যালয়।

৮. মিত্র, মধু। (২০১৫)। ভারত নির্মাণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। আর্ট পাবলিশিং।

৯. হ্যামল্যান্ড, এরিক। (২০১১)। স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়।

১০. শ্রী সারদা মঠ। (২০১৭)। নিবোধত, ৩১ (১), ৭৬।

১১. উদ্বোধন কার্যালয়। (২০১৯)। উদ্বোধন, ১২১ (৩), ০৯।